# ঈদুল ফিতর
# ঈদুল আযহা

আবদুস শহীদ নাসিম

# ঈদুল ফিতর
# ঈদুল আযহা

আবদুস শহীদ নাসিম

**ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা**
**আবদুস শহীদ নাসিম**

শ. প্র. : ৩৫
ISBN : 978-984-645-063-7



প্রকাশক
**শতাব্দী প্রকাশনী**
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৮৩১৭৪১০, ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল: shotabdipro@yahoo.com

প্রকাশকাল
১ম মুদ্রণ : মে ১৯৮৭ ঈসায়ী
পঞ্চম মুদ্রণ : জুলাই ২০১২ ঈসায়ী

মুদ্রণ
**আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস**
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

---

**মূল্য : ২০.০০ টাকা মাত্র**

---

**Eidul Fitr Eidul Adha** By Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone: 8317410, 01753422296. First Edition: May 1987, 5th Print: July 2012, E-mail: shotabdipro@yahoo.com

**Price Tk. 20.00 Only.**

## সূচিপত্র

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ইসলামের ঈদ কালচার

সারা বিশ্বের প্রায় সোয়াশ' কোটি মুসলমানের হৃদয় জুড়ে ঈদ আসে প্রতি বছর। ঈদের আনন্দ অনুভব করে মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্য। ঈদ ধনী গরীব, সাদা কালো সকল মুসলমানের জন্যেই সমান। আরব আজম তথা এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া - যেখানেই আছে মুসলিম, সেখানেই আছে ঈদ। ঈদের আনন্দে সকল মুসলমানের সমান অধিকার। ভৌগলিক সীমানার সাথে নেই এর কোনো সম্পর্ক। এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও আদর্শের সাথে।

মুসলিম কোনো ভৌগোলক জাতি নয়, ভাষা কেন্দ্রিক জাতি নয়, নয় নিরেট কোনো ধর্মীয় জাতি। মুসলমান একটি উম্মতের নাম, 'মুসলিম উম্মাহ' হিসেবে এর পরিচয়। কতগুলো সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস ও বিধানের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে এ উম্মাহ। তাই এটি একটি আদর্শিক উম্মাহ। অর্থাৎ মুসলমান একটি আদর্শিক জাতির নাম। তাই সারা বিশ্বের মুসলমান একই বিশ্বাস ও বিধানের অনুসারী। একই সাংস্কৃতিক মূল ধারার অধিকারী তারা। কারণ তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি তো তাদের আদর্শ প্রসূত।

সারা বিশ্বের মুসলমান এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী, রিসালাতে বিশ্বাসী, আখিরাতে বিশ্বাসী, এক কিতাব আল কুরআনের তারা অনুসারী, এক রসূল মুহাম্মদ সা.-এর তারা অনুগামী। এক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর পুরস্কারের তারা আকাংখী। তারা সকলেই আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট। সুতরাং গোটা বিশ্বের সমস্ত মুসলমান একমুখী। হযরত রসূলে করীম সা. বলেছেন : 'গোটা মুসলিম উম্মাহ্ এক দেহ স্বরূপ। তার কোনো একটি অংগ অসুস্থ্ হলে গোটা দেহ কষ্ট অনুভব করে।'

সত্যি তাই। দূর প্রাচ্যের ফিলিপিন, মধ্য এশিয়ার আফগানিস্তান, মধ্য প্রাচ্যের ফিলিস্তিন, আফ্রিকার আলজেরিয়া, ইউরোপের বসনিয়া চেচনিয়ায়ও যদি কোনো মুসলমান বিপদগ্রস্ত হয়, তবে সেজন্যে বাংলাদেশের মুসলমান দু:খ অনুভব করে, সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। দু:খের মতো মুসলমানদের একজনের আনন্দও সকলের। মূলত একই বিশ্বাস ও আদর্শের রজ্জুতে বাঁধা বলেই তারা মানসিকভাবে পরস্পর এতোটা আপন।

সারা বিশ্বের মুসলমান রমযান মাসে রোযা রাখে। রোযার শেষেই আসে তাদের ঈদ। তারপর হজ্জের মওসুমে আসে কুরবানীর ঈদ। সারা বিশ্বের সকল মুসলমান ঈদের আনন্দে শরীক হয়। ঈদ ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। মুসলমনাদের ঈদ মূলত বিশ্ব ঈদ। অর্থাৎ ঈদের দিনটি বিশ্বজনীন খুশি ও আনন্দের দিন।

পৃথিবীর সবজাতিরই আনন্দ উৎসবের দিন আছে। কিন্তু মুসলমানদের ঈদ অন্যসব লোকের আনন্দ উৎসবের চাইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী। ঈদের এ স্বাতন্ত্র্য তার অন্তর এবং অঙ্গ উভয় দিকেই। এ স্বাতন্ত্র্যের কারণে ইসলামের ঈদ শুধু খুশি আর আনন্দই বিলায় না, বরং সেই সাথে মানবতাবোধ এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিও বিতরণ করে।

ঈদ একটি অনন্য সভ্যতার প্রতীক। ঈদ এলে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠে ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, সহানুভূতি এবং একজনের দু:খ, দারিদ্র ও আনন্দে আরেক জনের অংশীদার হবার আকুতি।

ঈদের বয়স 'চৌদ্দশ' বছর। মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসে রসূলে করীম সা. দেখতে পান, এখানকার লোকেরা বছরে দুটি উৎসব পালন করে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের এ দুটি দিন কি রকম? তারা বললো : সেই জাহেলি আমল থেকে আমাদের মধ্যে এ দুটি দিন পালনের ধারা চলে আসছে। আমরা এ দু'দিন খেল-তামাশা করে কাটাই।'

অতপর আল্লাহ্র রসূল তাদের বললেন : শুনো, আল্লাহ জাহেলি যুগের সেই দুটি দিনের চাইতে উত্তম দুটি দিন তোমাদের উপহার দিয়েছেন - একটি ঈদুল ফিতর, আর অপরটি ঈদুল আযহা। এখন থেকে খুশি ও আনন্দের দিন হিসেবে এ দুটি দিন উদযাপন করো।

সেই থেকে বিগত চৌদ্দশ বছর ধরে মুসলিম উম্মাহ দুই ঈদ উদযাপন করে আসছে। রসূলের যুগে রসূলে করীম সা. ঈদের সূচনা করতেন দু'রাকাত নামায আদায় এবং একটি ভাষণ দানের মাধ্যমে। তিনি সাহাবাদের নিয়ে উন্মুক্ত মাঠে চলে যেতেন। সেখানে গিয়ে আযান এবং ইকামত ছাড়াই নিজের নেতৃত্বে সবাইকে নিয়ে দু'রাকাত নামায পড়তেন। নামাযের সালাম ফেরানোর পর তিনি সবাইকে বসতে বলতেন। সবাই বসে পড়তো। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন। তাদের উপদেশ নসীহত করতেন এবং পথ নির্দেশনা দান করতেন। তিনি দুটি ভাষণ দিতেন। প্রথম ভাষণের পর ক্ষণিকটা বসে আরেকটি ভাষণ দিতেন। দ্বিতীয় ভাষণে মুসলমানদের উন্নতি, সাফল্য ও কল্যাণের জন্যে দু'আ করতেন এবং ইসলামের শত্রুদের উপর বদদোয়া করতেন।

রসূলের যুগে মহিলারাও রসূলের সাথে মাঠে গিয়ে নামায আদায়ের মাধ্যমে ঈদের সূচনা করতেন। রসূল সা. পুরুষদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার পর মহিলাদের

কাছে এসে তাদের উদ্দেশ্যে আলাদা ভাষণ দিতেন। তিনি তাদের বেশি বেশি দান করার উপদেশ দিতেন।

রসূলে করীম সা. ঈদগাহে যেতেন একপথে আর ফিরে আসতেন অপর পথে। পথিমধ্যে উচ্চস্বরে তাকবীর পড়তেন। সালাম-কালাম এবং মুসাফাহা ও গলাগলি করতেন। দরিদ্রদের খোঁজ খবর নিতেন। দান-সদাকা করতেন। সকলকে ঈদের আনন্দে শরীক করতেন।

এভাবে রসূল সা. এবং সাহাবাগণ আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সূচনা করতেন ঈদের। তারপর মানুষের কল্যাণ ও সেবা করার মাধ্যমে খুশি ও আনন্দ ছড়িয়ে দিতেন ঘরে ঘরে, প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে।

ইতিহাসের কালতিক্রম করে ঈদের সেই ঐতিহ্য চলে আসছে আমাদের কালেও। মদীনার সেই ঈদ ছড়িয়ে পড়েছে কালক্রমে সারা বিশ্বে।

বাংলাদেশ একটি সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম দেশ। এখানে ঈদ আসে মহাসমারোহে। ঈদ উদযাপনের জন্যে এখানে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় মাস খানেক আগে থেকেই। আবার ঈদ চলে যাবার পরও এর আমেজ থাকে প্রায় সপ্তাহ্ খানেক ধরে।

আমাদের মাঝে বছর ঘুরে আসে ঈদুল ফিতর। রসূলে করীম সা. এই ঈদকে সার্বজনীন করার জন্যে এক অনুপম ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন। সমাজে যারা দরিদ্র, অর্থের অভাবে ঈদের খুশিতে শরীক হতে পারেনা, তারা যেনো ঈদের খুশিতে শরীক হতে পারেন, সেজন্যে রসূলে করীম সা. বিত্তবানদের উপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী বা তার মূল্য দরিদ্র মুসলিমদের দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তা যেনো ঈদ শুরু হবার আগেই দেয়া হয়, সে নির্দেশও দিয়েছেন। এই দানটির নাম সদাকাতুল ফিতর বা ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দান।

বছর ঘুরে আসে ঈদুল আযহা - কুরবানীর ঈদ। এই ঈদে মূলত পশু কুরবানীর মাধ্যমে মহাবিশ্বের মালিকের ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির জন্যে আত্ম ত্যাগরে প্রতীকী নিদর্শন স্থাপন করে মুসলিম উম্মাহ্। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে একজন মুসলিম যে নিজের জীবন ও অর্থ সম্পদ কুরবানী দিতে সদা প্রস্তুত, পশু কুরবানীর মাধ্যমে সে একথার প্রমাণ পেশ করে। পশু কুরবানীর মাধ্যমে সে যেমন তার অর্থ-সম্পদ কুরবানী দিতে মোটেও কুণ্ঠিত হয়না, তেমনি প্রয়োজন দেখা দিলে সে নিজের জীবন কুরবানী দিতেও কুণ্ঠিত হবেনা।

কুরবানী কালচারের এ হলো মূল ভিত্তি। ফলে সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মতের মাঝে কুরবানী আসে মহাসমারোহে। মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি প্রস্তুতি নিতে থাকে কুরবানী করার।

কেউ কুরবানী করে নিজের গৃহপালিত অতি আদরের কোনো পশু। কেউবা কিনে এনে কুরবানী করে মানানসই কোনো পশু।

যিনি গৃহপালিত পশু কুরবানী করেন, তার পরিবারের সবাই মিলে বিশেষ যত্নে প্রতি পালন করতে থাকে সেই পশুটিকে। পরিবারের সবার হৃদয়ের সাথে, প্রাণের সাথে একাকার হয়ে যায় সেই পশুটি। কুরবানীর দিন তারা যেনো নিজেদের প্রাণটাই কুরবানী করে দেয় আল্লাহ্‌র পথে।

যারা বাজার থেকে পশু কিনে এনে কুরবানী করে, তাদের মধ্যেও বেশ আগে থেকেই আয়োজন শুরু হয়ে যায় পশু কেনার। ছাগল, ভেড়া, দুম্বার একটা পশু একজনের পক্ষ থেকেই কুরবানী করা যায়। কিন্তু উট, গরু একটা সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়। ফলে, মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকেরা পশু কুরবানীকে কেন্দ্র করে জামাতবদ্ধ হতে শুরু করে। কয়েক পরিবারের লোকেরা জোটবদ্ধ হয়ে কুরবানী করে একটি উট বা গরু।

জোটবদ্ধ হয়ে কিংবা পরিবারের পুরুষেরা সবাই মিলে হাঁটে যায় কুরবানীর পশু কেনার জন্যে। সে কী আনন্দ! বড়দের চাইতে ছোটদের আনন্দ আরো বেশি!

কুরবানীর পশুর হাট, সে কি মনোরম দৃশ্য! ব্যাপারীরা গ্রাম-গঞ্জ থেকে পশু কিনে এনে বাজার ভরে ফেলে। শহরগুলোতে তো বিভিন্ন মাঠে আলাদা কুরবানীর পশুর হাট বসে।

প্রায় পনের দিন আগে থেকেই কুরবানীর পশু কেনাবেচা শুরু হয়ে যায়। এক সপ্তাহ আগে থেকে জমজমাট হয়ে উঠে পশুর বাজার। কুরবানীর দুই তিন দিন আগে থেকে তো বেচাকেনার দারুন ধুম পড়ে যায়। তখন পশুর হাটে ঢোকা দুরূহ হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা তো এ সময় প্রচন্ড ভীড়ে বাজারে ঢুকতেই পারেন না।

পশু কেনার ছোট ছোট জোট বাজারের মধ্যে অনবরত ঘুরতে থাকে। তারা খুঁজতে থাকে কুরবানীর উপযোগী একটি মানানসই পশু। এ খোঁজাখুজির ব্যাপারটা করে তারা নিজের আর্থিক সামর্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই। ক্রেতারা দাম জিজ্ঞেস করে, বিক্রেতারা বিরাট করে দাম হাঁকে। চলতে থাকে দর কষাকষি। তবে পছন্দসই পশু পেলে অনেকেই দামের পরোয়া করেনা। আল্লাহ্‌র জন্যে একটি ভালো পশু কুরবানী দেয়াটাই আসল উদ্দেশ্য।

পশু কিনে বাড়ির দিকে রওয়ানা করার পথে শুরু হয় আরেক দৃশ্যের। রাস্তার দু'পাশ আর বাড়ি ঘর থেকে লোকেরা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে - কে কী রকম পশু কিনলো? পশু দেখে তারা পশু সম্পর্কে মন্তব্য করতে থাকে। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, বাড়ি পৌঁছা পর্যন্ত গোটা পথে পশু ক্রেতাদের সবচাইতে বেশি ব্যস্ত রাখে যে জিনিসটি তাহলো - দর্শকদের একটি প্রশ্ন - 'কতো হয়েছে?' 'দাম কতো?' 'কতো টাকা দিয়ে কিনেছেন?' 'কতো টাকা নিয়েছে?'

অতি ঔৎসুক্যের সাথে এই প্রশ্নবানে জর্জরিত করে গোটা পথের দর্শকরা। ক্রেতা

পক্ষও খুব আগ্রহের সাথে জবাব দেয় - 'দশ হাজার, বার হাজার, পনের হাজার, বিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার।' এভাবে যিনি যে দামে পশু কিনেছেন গোটা পথ জুড়ে তাকে সেই ক্রয় মূল্যের কথা প্রকাশ করে যেতে হয় উৎসুক দর্শকদের কাছে।

লোকেরা এভাবে প্রশ্ন করে এবং জবাব দিয়ে একটা আনন্দ বোধ করে, একটা তৃপ্তি অনুভব করে হৃদয়ের মাঝে।

এরপর পশু যখন বাড়িতে এসে পৌঁছে, তখন শুরু হয় আরেক দৃশ্য। বড়ির সব নারী-পুরুষ শিশু-কিশোর মহোৎসবে এসে ভীড় জমায় কুরবানীর পশু দর্শনের জন্যে। এ দর্শনের মধ্যে রয়েছে একটা ভিন্ন আনন্দ একটি বিশেষ আগ্রহ এবং একটা প্রশান্ত তৃপ্তি।

অতপর কুরবানীর দিনক্ষণ আসা পর্যন্ত পশুটিকে যত্নে-আদরে লালন-পালন করতে থাকে সবাই মিলে। আল্লাহ্‌র জন্যে কুরবানী করা হবে যে পশু, তার দিকে সকলেরই একটা শ্রদ্ধার নজর থাকে, সবাই ওকে ভালোবাসে।

কুরবানীর দিন সকালে ঈদের সালাত আদায় করে আসা মাত্রই মহাসমারোহে শুরু হয়ে যায় আল্লাহ্‌র জন্যে পশু কুরবানীর কাজ।

শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, বাড়িতে বাড়িতে, ঘরে ঘরে ধুম পড়ে যায় পশু কুরবানীর। অনেকেই নিজের পশু নিজেই কুরবানী করেন। আবার অনেকেই আলেম-উলামা ডেকে এনে কুরবানী করান। প্রায় দুপুর পর্যন্ত কুরবানীর মহোৎসব চলতে থাকে। কেউ যবেহ্ করে, কেউ চামড়া ছাড়ায়, কেউ গোশ্‌ত কাটে, কেউ ভাগ-বাটোয়ারা করে। কেউ নিজেরা করে, কেউ পেশাদার শ্রমিক নিয়োগ করে।

পশুর চামড়া দান করে দেয়া হয় গরীব দু:খীদের, মকতবে, মাদ্রাসায়, এতীমখানায় কিংবা লিল্লাহ্ বোর্ডিং-এ। আবার অনেকেই চামড়া বিক্রি করে টাকা দান করে দেন।

যবেহ্ করা, চামড়া ছাড়ানো এবং গোশ্‌ত কাটার পর শুরু হয়ে যায় গোশ্‌ত বিতরণের কাজ। অনেকেই একটি পশুর তিনভাগের একভাগ গোশ্‌ত ঘরে নেয়ার আগেই-দারিদ্রের কারণে যারা কুরবানী করতে পারেনি- তাদেরকে পৌঁছে দেন, দান করে দেন।

এরপর শুরু হয়ে যায় আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিদের বাসায় গোশ্‌ত পাঠানোর ধুমদাম। একে অপরের বাসায় হাদিয়া পাঠাতে থাকে কুরবানীর গোশ্‌ত। সে যে কী আনন্দ! কী যে খুশির উৎসব! পরস্পরের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসার কী উৎকৃষ্ট নমুনা! নারী-পুরুষ শিশু-কিশোর সকলেই পরমানন্দে, পরম খুশিতে অংশ নেয় এই মহব্বত ও ভালোবাসার হাদিয়া তোহ্ফা আদান-প্রদানে।

এমন উৎকৃষ্ট মানব কালচার আল্লাহ্‌র নবীরা ছাড়া আর কেউ উপহার দিতে পারে কি?

ঈদ উপলক্ষে সার্বজনীন মেহমানদারীর রেওয়াজও প্রচলন করা হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি, বন্ধু-বান্ধব এবং যে কোনো মুসলমান যে কোনো মুসলমানের বাড়িতে মেহমান হতে পারে। মেহমানদারি করা এবং মেহমান হওয়া ঈদের অনিবার্য অংশ। সামর্থবান ব্যক্তিরা আগে থেকেই মেহমানদারি করার প্রস্তুতি নেন। এমনকি দরিদ্র মুসলমানরাও ঈদের দিন কিছুনা কিছু মেহমানদারি করার প্রস্তুতি নেন। ঈদের দিন মুসলমানদের ঘরে সাধারণ আমন্ত্রণ থাকে। মেহমান এলে ধনী-গরীব প্রতিটি মুসলমান আনন্দ অনুভব করেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী মেহমানদারি করেন। আমন্ত্রণ, আপ্যায়ন ও মেহমানদারির এই ধারাবাহিকতা ঈদের পরেও কয়েকদিন চলতে থাকে।

ঈদ উপলক্ষে নানা রকম খানা পাকানো হয়। যাদের সামর্থ আছে, তারা আইটেম সংখ্যা বাড়াতে থাকেন। প্রতি বছরই পুরাতন আইটেমের সাথে কিছু নতুন আইটেম যুক্ত করা হয়। মহিলাদের মধ্যে খাবার তৈরির ধুম পড়ে যায়। তারা নানা রকম সুস্বাদু খাবার তারা তৈরি করেন। খাবার তৈরি করে তারা দারুন আনন্দ পান এবং তার চাইতেও বেশি আনন্দ পান তারা মেহমানদারি করে।

ঈদ উপলক্ষে মুসলমানদের মধ্যে আরেকটি প্রথা সেই প্রথম থেকেই চলে আসছে। তাহলো নতুন জামা কাপড় কেনা। ঈদ আসার পনের বিশ দিন আগে থেকেই কেনা কাটার ধুম লেগে যায়। বাজারেও আসে নতুন নতুন ডিজাইনের জামা কাপড়। সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবারেই নতুন নতুন জামা কাপড় কেনা হয়। নিজেদের জন্যে কেনা হয়। আত্মীয়-স্বজনের জন্যে কেনা হয়। বন্ধু বান্ধবদের উপহার দেয়া হয়। এতীম, বিধবা ও গরীবদের দান করা হয়। অনেক লোক ঈদ উপলক্ষে যাকাতের টাকা দিয়ে গরীবদের জামা-কাপড় কিনে দেন। এভাবে ঈদ উপলক্ষে কদাচিৎই কোনো মুসলিম নতুন জামা কাপড় থেকে বঞ্চিত থাকেন।

ঈদের সময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের হাট বাজারগুলো হয়ে উঠে জমজমাট। বাংলাদেশের বাজারগুলোতে তো ঈদের সপ্তাহ খানেক আগে থেকে ঢোকাই মুশকিল হয়ে পড়ে। পুরুষ, মহিলা, শিশু, কিশোর সকলেই বাজারে যায়। প্রচন্ড ভীড়ের চোটে অনেক মহিলা বাজারে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অনেক অসৎ ব্যবসায়ী ঈদের সময় জিনিসপত্রের দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। এসময় কালো বাজারীরাও তৎপর হয়ে উঠে। সরকারের উচিত ঈদের সময় বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।

ঈদুল ফিতরে ঈদের নামায পড়ার পরই শুরু হয় বেড়াবার এবং মেহমানদারি করবার পালা। ঈদের দিন বাংলাদেশের রাস্তাঘাট - ঘরবাড়ি ঈদময় হয়ে উঠে। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের বাড়ি যাওয়া আসাতে গ্রাম গঞ্জ, শহর বন্দর

মুখরিত হয়ে উঠে। সবাই নতুন নতুন জামা কাপড় পরে দলে দলে এবং একাকী যাওয়া আসা করছে। যাদের পক্ষে সম্ভব তারা আতর-সুগন্ধি লাগিয়ে বেরুচ্ছে। ফলে ঈদের দিন সৃষ্টি হয় এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ও পরিবেশের।

ঈদগাহে, রাস্তাঘাটে, ঘরে ঘরে, বাড়িতে বাড়িতে অবতারণা ঘটে আরেকটি মনমাতানো দৃশ্যের। সেটি হলো সালাম আদান প্রদানের, হাতে হাত মিলানোর, বুকে বুক মিলানোর এবং গলাগলি করবার দৃশ্য! কী মনোরম দৃশ্য! যেনো এ সমাজের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আপনজন। হায়, আমাদের প্রতিটি দিনই যদি ঈদের দিনের মতো হতো!

শিশু কিশোররা ঈদকে উপভোগ করে সবচে' বেশি। ঈদ সমাগত হলে ওরা অধীর হয়ে পড়ে। ঈদকে বরণ করার জন্যে ওদের ব্যস্ততা থাকে সবচে' বেশি। ওদের কিন্তু নতুন জামা কাপড় চাই-ই। শিশু কিশোররা যখন নতুন জামা কাপড়-টুপি পরে ঈদগাহে যায়, তারা যখন কোলাকুলি করে, যখন মেহমান হয় এবং মেহমানদারি করে, তখন সেটা হয় সবচাইতে বেশি আনন্দের।

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে ঈদের আরেকটি বড় আনন্দ আছে। সেটা হলো, যারা শহরে চাকরি করে, ব্যবসা করে, পড়ালেখা করে, ঈদ উপলক্ষে তারা গ্রামে ফিরে। ঈদের ছুটি আসার আগে থেকেই তাদের বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। গ্রামের বাড়িতে বাবা মা, স্ত্রী, পুত্র কন্যা, ভাইবোন এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের জন্যে তারা সামর্থ অনুযায়ী কেনাকাটা করেন। এভাবে গ্রামের বাড়ির ঈদকে সাধ্যানুযায়ী খুশিতে আনন্দে ভরে দেবার মতো প্রস্তুতি নিয়ে তারা রওয়ানা করেন বাড়ির উদ্দেশ্যে। এসময় বাড়ি যাবার কষ্ট সীমাহীন। যানবাহনে ঠাঁই নেই। বাস-ট্রেনের ছাদে উঠে এবং দরজায় ঝুলে জীবন বাজি রেখে রওয়ানা করেন অনেকে।

ওদিকে বাড়ির আপনজনরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থাকেন - কখন এসে পৌঁছুবে তার কলিজার টুকরা। মা ছেলের পথ চেয়ে থাকেন, স্ত্রী স্বামীর পথ চেয়ে থাকেন, সন্তানেরা বাবার পথ চেয়ে থাকে। শেষ মেশ আপনজনরা নিদারুণ কষ্টের পথ পাড়ি দিয়ে বাড়ি এসে পৌঁছায় আর ভুলে যায় পথের সমস্ত কষ্টের কথা। আপনজনদের পেয়ে বাড়ির লোকেরাও হৃদয়াবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠে।

আসলে ঈদ ইসলামী উম্মাহর এক অনন্য কালচার। ঈদ ইসলামী সমাজে বয়ে আনে ঐক্য ও একতার বারতা। ঈদ ইসলামী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে ভ্রাতৃত্ববোধে, সহমর্মিতায়। ঈদ মিলনের ও আপনত্বের বার্তা বয়ে আনে। ঈদ মুসলমানের হৃদয়কে উন্মুক্ত প্রসারিত করে দেয় আকাশের মতো। ঈদ দূর করে দেয় জীবনের সব গ্লানি, হৃদয়ের সব কালিমা। ঈদের দিনের খোলা হৃদয়, মিষ্টি হাসি আর ঐক্য ও একতার এই অনুপম আবেশ বর্তমান ঘুণে ধরা মুসলিম সমাজকে গড়ে তুলতে পারে, উন্নত ও শ্রেষ্ঠতম জাতি হিসেবে।

তাই আমাদেরকে ঈদের শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে। একমাস সিয়াম সাধনার পর আমাদের সামনে সমাগত হয় ঈদুল ফিতর। ঈদুল ফিতর মূলত রোযা ভাংগার খুশির দিন। একমাস ঠিকমতো রোযা আদায় করতে পারার খুশির দিন।

মাসব্যাপী মহান আল্লাহ্‌র গোলামী ও তাবেদারিতে নিজেকে নিবেদিত করতে পারার খুশির দিন। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার সময় একজন মুসলমান যে সততা, সত্যনিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌ভীতির পরিচয় দিয়েছে, সারা বছর সেটাই তার জীবনাদর্শ হওয়া উচিত। সূর্যোদয়ের আগেই সে সেহেরি খাওয়া শেষ করে দেয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সে পানাহার বন্ধ করে দেয়। এমনটি করে সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করে। সারাদিন দিনের বেলায় সে ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে, কিন্তু পানাহার করেনা। কামনা বাসনা চরিতার্থ করেনা। পানাহার ও কামনা চরিতার্থ করার কোনো সুযোগই সে গ্রহণ করেনা। কারণ, সে এক আল্লাহ্‌কে ভয় করে। সে আত্মার দাসত্ব করেনা, দাসত্ব করে এক আল্লাহ্‌র। সূর্যাস্তের সাথে সাথে সে রোযা শেষ করতে বিলম্ব করেনা। এক্ষেত্রেও সে সময় মতো ইফতার করে আল্লাহ্‌র নির্দেশেরই অনুবর্তন করে।

পুরো একমাস ব্যাপী মুসলমান এভাবে আত্মসংযম, সততা, সত্যনিষ্ঠা, আল্লাহ্‌ভীতি, আল্লাহ্‌র গোলামী ও আনুগত্য এবং নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার যে অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, ঈদুল ফিতর সেই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী উৎসব অনুষ্ঠান। এ দিনটি মাসব্যাপী সফল প্রশিক্ষণ গ্রহণের উৎসবের দিন।

কুরবানীর আত্ম ত্যাগ আর সহমর্মিতার প্রশিক্ষণ আর সেই সাথে রমযানের এক মাসের প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে যদি বছরের বাকি মাসগুলোতে দক্ষতার সাথে জীবনের সমস্ত কাজ পরিচালনা করা হয়, তবেই মুসলিম জাতি হিসেবে আমরা ফিরে পেতে পারি আমাদের সেই হারানো গৌরব। তবেই সফল হতে পারে আমাদের ঈদ। আমরা কি পারিনা আমাদের ঈদের আনন্দকে রোযার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে জীবন ও সমাজ পরিচালনার দীপ্ত শপথে পরিণত করতে? আমরা কি পারিনা ঈদের শিক্ষার ভিত্তিতে আমাদের সমাজ নির্মাণের শপথ নিতে?

●

## ১. সব জাতিরই আনন্দ উৎসবের দিন আছে

এই পৃথিবীতে অসংখ্য ভৌগলিক ও সাম্প্রদায়িক জাতির বসবাস রয়েছে। রয়েছে অনেক উন্নত আর অনুন্নত কওম। আরো রয়েছে বিভিন্ন বর্ণ, বংশ ও গোত্রীয় সম্প্রদায়ের মানুষ। এ সব ধরনের মানুষেরই আনন্দ উৎসবের জন্যে বছরের বিভিন্ন দিন নির্ধারিত আছে। এসব নির্ধারিত দিনে তারা স্ব স্ব পদ্ধতিতে আনন্দ উৎসব পালন করে থাকে। তাদের এ উৎসবের দিনসমূহ নির্ধারিত হয়েছে নিজেদের জাতীয় বা ধর্মীয় কোনো ঘটনা কিংবা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। প্রত্যেক জাতিই তাদের আনন্দ উৎসবে নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও আকীদাহ্ বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। এসব উৎসবের মাধ্যমে প্রত্যেক জাতি নিজেদের জাতীয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আসছে। বস্তুত এসব উৎসব প্রত্যেক জাতির নিজস্ব প্রাণ স্পন্দন।

## ২. ইসলামের দুই ঈদ

আমরা মুসলিম। ইসলাম আমাদের জীবন ব্যবস্থা। আমাদের আকীদাহ্ বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তিতে আমাদের রয়েছে স্বতন্ত্র তাহযীব তমদ্দুন ও সভ্যতা সংস্কৃতি। আমাদের আদর্শ ভিত্তিক এই সভ্যতা সংস্কৃতিই আমাদেরকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

তাওহীদি ঈমান হচ্ছে আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির ভিত্তি। তাই আমাদের আনন্দ উৎসব, যা আমাদের সংস্কৃতির এক প্রকার বাহন, তাতে আমাদের ঈমান ও আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটে থাকে। ইসলামের আনন্দ উৎসব সর্বপ্রকার বাজে হাসি তামাসা ও নিরর্থক জৌলুস থেকে মুক্ত। এখানকার আনন্দ উৎসব বেহুদা কর্মকান্ড ও অশ্লীল আচার অনুষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এখানকার উৎসবে শিরক আর ব্যক্তিপূজার নেই কোনো স্থান। কারণ মুমিনদের বৈশিষ্টই তো হচ্ছে :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. (المؤمنون) : ٣

অর্থ : তারা বাজে ও নিরর্থক কাজ থেকে দূরে থাকে। (সূরা আল মুমিনুন : আয়াত ৩)

وَاِذَا مَرُّوْابِاللَّغْوِمَرُّوا كِرَامًا. (الفرقان : ٧٢)

অর্থ : কোনো অর্থহীন বিষয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে হলে তারা শরীফ মানুষের মতোই অতিক্রম করে। (সূরা আল ফুরকান : আয়াত ৭২)

তাই জাহেলি সমাজের বাতিল আনন্দ উৎসব পরিহার করে ইসলাম তার আদর্শের ভিত্তিতে দুই ঈদ প্রবর্তন করেছে। দুই ঈদের প্রবর্তন সম্পর্কে হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন :

قَدِمَ النَّبِيُّ ص المَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ: مَاهَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوْاكُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِيَ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص قَدْ اَبْدَ لَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَاخَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

অর্থ : নবী করীম সা. মদীনায় আগমন করার পর দেখলেন মদীনা বাসীদের দুটি (উৎসবের) দিন রয়েছে, যাতে তারা খেলাধুলা করে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এই দিন দুটি কেমন? তারা বললো, জাহেলি জীবনে আমরা এই দুদিন খেল তামাশা করতাম। রসূলে করীম সা. বললেন : আল্লাহ তায়ালা সেই দু'দিনের পরিবর্তে সেগুলো অপেক্ষা উত্তম দুটি দিন তোমাদের দান করেছেন। একটি হলো আযহার দিন এবং অপরটি ফিতরের দিন। (আবু দাউদ)

সেই থেকে মুসলমানদের বার্ষিক উৎসবের দিন হিসেবে এই দুটি দিন ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালিত হয়ে আসছে।

## ৩. ইসলামে ঈদের প্রকৃতি

ক. সালাত আদায়ের মাধ্যমে সূচনা : যেহেতু ইসলামের ঈদ কোনো বাজে ও নিরর্থক বিষয় নয়, বরঞ্চ নিজস্ব আকীদাহ বিশ্বাস এবং সভ্যতা ও আদর্শ প্রকাশের বাহন, সেজন্যে বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে সিজদায় মস্তক অবনত করার মাধ্যমে এ উৎসবের সূচনা করতে হয়। মুসলমানদের যাবতীয় তৎপরতা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যেই নিবেদিত। তাদের ঈদ তথা আনন্দ উৎসবের মর্ম মূলেও নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। এ জন্যেই তাদের ঈদের আনন্দও শুরু হয় সিজদার মাধ্যমে। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রা. বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ ص يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحَى اِلَى الْمُصَلَّى فَاَوَّلُ

شَىْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلٰوةُ- (بخارى- مسلم)

অর্থ : নবী করীম সা. ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের দিকে বের হয়ে যেতেন। সেখানে গিয়ে সর্বপ্রথম তিনি যে কাজটি করতেন, তা হচ্ছে সালাত আদায়। (বুখারি, মুসলিম)

খ. ভ্রাতৃত্বের ঈদ : মুসলমানদের ঈদ উৎসবে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের পরম সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। এ উৎসবে কেউ আপন কেউ পর থাকেনা, বরঞ্চ এখানে সবাই আপন ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়। একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে যায়। এখানেই ঈদের পরম আনন্দের চরম স্ফুরণ ঘটে।

গ. সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ঈদ : ঈদ এলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার জন্যে মুসলমানদের হৃদয়ের দুয়ার খুলে যায়। গরীব দু:খী সকলেই যেনো ঈদের খুশিতে অংশ নিতে পারে সে জন্যে বিত্তবানদের প্রতি ইসলাম বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছে। এজন্যে ধনীদের পক্ষ থেকে বিত্তহীনদেরকে ঈদুল ফিতরে আর্থিক সহযোগিতা করা হয় এবং কুরবানীর ঈদে তাদের মধ্যে কুরবানীর গোশ্‌ত বিতরণ করা হয়।

ঘ. মেহমানদারির ঈদ : ঈদ এলে মুসলমানরা সকলে ভাই ভাই হয়ে যায়। সবাই যেনো সবার আত্মীয়। সবাই সবার মেহমান। আজ এক মুসলমানের ঘর আরেক মুসলমানের মেহমানদারির জন্যে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। ধনী দরিদ্র সকলেই সকলের আপনজন।

## ৪. ঈদের নামায

ঈদের নামায দু'রাকাত। ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে এই নামায ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিকের মতে সুন্নত। এই দু'রাকাত নামাযের আগে পরে কোনো নামায নেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন :

اَنَّ النَّبِىَّ ص صَلّٰى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا -(بخارى، مسلم)

অর্থ : নবী করীম সা. ঈদুল ফিতরের দিন মাত্র দু'রাকাত নামায পড়েছেন। এর আগে পরে আর কোনো নামায পড়েননি। (বুখারি, মুসলিম)

ঈদুল আযহার জন্যেও এই একই বিধান।

## ৫. নামাযের পরে খুতবা

নবী করীম সা. ঈদের নামাযের পরে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে খুতবা বা ভাষণ দিতেন। এ খুতবা সুন্নত। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রা. বলেন, নবী করীম সা. ঈদগাহে সর্বপ্রথম নামায আদায় করতেন। তারপর :

فَيَقُوْمُ مَقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ. (بخاری، مسلم)

**অর্থ** : তারপর তিনি জনতার দিকে ফিরে দাঁড়াতেন আর জনতা তখন নিজেদের সারিতে বসা থাকতো। দাঁড়িয়ে তিনি তাদের উপদেশ দিতেন, নসীহত করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। (বুখারি, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص وَاَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ رض يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (بخاری، مسلم)

**অর্থ** : রসূলুল্লাহ সা. আবু বকর রা. এবং উমর রা. দু'ঈদে খুতবার পূর্বেই নামায আদায় করতেন। (বুখারি, মুসলিম)

## ৬. ঈদের নামাযে আযান ও ইকামত নেই

আযান ও ইকামত ছাড়াই ঈদের নামায শুরু করতে হয়। রসূলে করীম সা.-এর এটাই ছিলো নিয়ম। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা. বলেন :

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَّلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلَا اِقَامَةٍ. (رواه مسلم)

**অর্থ** : একবার দু'বার নয়, বহুবার আমি রসূলে করীম সা.-এর সংগে দু'ঈদের নামায পড়েছি। আযান এবং ইকামত ছাড়াই তিনি ঈদের নামায আদায় করতেন। (মুসলিম)

## ৭. মহিলাদের ঈদের নামায

সমাজ, পরিবেশ ও নৈতিক অবনতির কারণে পরবর্তীকালে মহিলাদেরকে নামাযের জামায়াতে আসতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু নবী করীম সা.-এর যামানায় তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ন্যায় ঈদের জামায়াতেও শরীক হতেন এবং এজন্যে তাদের উৎসাহিত করা হতো। হযরত উম্মে আতীয়া রা. বলেন :

أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ دَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ. (بخارى، مسلم)

**অর্থ :** আমাদের (মহিলাদের) নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আমরা যেনো দু'ঈদে ঋতুবতী এবং পর্দানশীন মহিলাদের ঈদগাহের দিকে বের করে আনি, যাতে করে তারা মুসলমানদের জামায়াত ও দোয়ায় শরীক হতে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলাদের নামায থেকে আলাদা থাকতে বলা হয়েছে। (বুখারি, মুসলিম)

## ৮. এক পথে যাওয়া আরেক পথে আসা

ঈদগাহে যাওয়ার সময় এক পথে যাওয়া এবং সেখান থেকে ফেরার সময় অপর পথে ফেরা সুন্নত। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ ص اِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيْدِ خَالَفَ الطَّرِيْقَ. (بخارى)

**অর্থ :** নবী করীম সা. ঈদের দিন গমনাগমনের রাস্তা পরিবর্তন করতেন। (বুখারি)

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِيْ طَرِيْقٍ رَجَعَ فِيْ غَيْرِهٖ- (ترمذى)

**অর্থ :** নবী করীম সা. ঈদের দিন এক রাস্তায় বের হতেন এবং অপর রাস্তায় ফিরতেন। (তিরমিযি)

## ৯. বড় মাঠে ঈদের নামায পড়া

ঈদের নামায মাঠে পড়া সুন্নত। নবী করীম সা. মাঠে ঈদের নামায পড়তেন। মাঠ অভিমুখে তিনি এক পথে রওয়ানা করতেন এবং অন্য পথে ফিরে আসতেন। মহিলারাও ঈদের মাঠে নামায ও খুতবায় শরীক হতেন। তবে মেঘবৃষ্টির দিন ঈদের নামায মসজিদে পড়তে দোষ নেই। হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন :

اَنَّهٗ اَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ (ص) صَلَاةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ. (ابوداؤد، ابن ماجه)

অর্থ : এক ঈদের দিন বৃষ্টি হলো। তাই নবী করীম সা. তাদের নিয়ে সে ঈদের নামায মসজিদে পড়েন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

মূলত এরকম ঠেকা ছাড়া ঈদের নামায মসজিদে না পড়ে ময়দানে পড়াই উচিত। কিন্তু আজকাল মুসলমানদের মধ্যে সংকীর্ণতা ও অনৈক্য সৃষ্টি হওয়ায় ঈদের নামায মসজিদে প্রবেশ করেছে।

## ১০. সালাতুল ঈদের সময়

সূর্য উঠার পর থেকে দুপুর পর্যন্ত ঈদের নামাযের সময়। কিন্তু ঈদুল আযহার নামায তড়িঘড়ি করে পড়া উচিত, যাতে মুসলমানরা কুরবনাী করে কুরবানীর গোশ্‌ত দিয়ে সেদিনের খানা শুরু করতে পারে। ঈদুল ফিতরের নামায সূর্যোদয়ের পর কিছুক্ষণ দেরি করে পড়াই ভালো। রসূলে করীম সা. নাজরানে নিযুক্ত তাঁর গভর্ণর আমর ইবনে হাযমকে এই লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে:

عَجِّلِ الْاَضْحٰى وَاَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ. (مشكوت)

অর্থ : কুরবানীর ঈদে তড়িঘড়ি করবে আর ঈদুল ফিতরে কিছু বিলম্ব করবে এবং জনগণকে ওয়ায নসীহত করবে। (মিশকাত)

## ১১. ঈদের নামাযে তাকবীর

রসূলে করীম সা. ঈদের নামাযের প্রতি রাকাতে কয়েকবার তাকবীর বলতেন। বিভিন্ন হাদিস থেকে বিভিন্ন সংখ্যক তাকবীরের কথা জানা যায়। যেমন চার, পাঁচ, সাত ইত্যাদি। ইমাম আবু হানীফা র. চার তাকবীর গ্রহণ করেছেন।

## ১২. ঈদের নামাযে কিরাত

রসূলে করীম সা. ঈদের নামাযে কিরাত উচ্চস্বরে পড়তেন এবং সাধারণত এসব সূরা পড়তেন : আল আ'লা, আল গাশিয়া, কাফ, আল কামার ইত্যাদি। (শাফেয়ী, আহমদ, তিরমিযি ও আবু দাউদ)

## ১৩. দু'ঈদের দিন সুন্নত কাজ

দু'ঈদের দিন এমন কিছু করণীয় সুন্নত ও মুস্তাহাব কাজ রয়েছে, যা কিনা রসূলে করীম সা. নিজের জীবদ্দশায় করে গেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

১. সাধ্য ও সামর্থ অনুযায়ী ঈদের সাজ পোষাকের ব্যবস্থা করা।
২. খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠা।
৩. মিসওয়াক করা।
৪. ফজরের নামাযের পর ঈদের নামাযের জন্যে গোসল করা।
৫. নতুন ও পরিচ্ছন্ন কাপড় চোপড় পরা।

৬. সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৭. ঈদগাহে যাবার আগে সাদাকাতুল ফিতর পরিশোধ করা।
৮. সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া।
৯. ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাবার আগে কিছু মিষ্টি খাওয়া।
১০. ঈদুল আযহার দিন কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া এবং কুরবানীর পশুর কলিজা বা গোশ্‌ত দিয়ে খাওয়া আরম্ভ করা।
১১. ঈদের নামায ঈদগাহে পড়া। নবী করীম সা. কেবলমাত্র বৃষ্টির দিন ঈদের নামায মসজিদে পড়েছেন।
১২. পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া।
১৩. ঈদগাহে একপথে যাওয়া, অন্য পথে আসা।
১৪. ঈদগাহে যাবার সময় তাকবীর পড়া।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

১৫. ঈদুল ফিতরে তাকবীর আস্তে পড়া এবং ঈদুল আযহায় উচ্চস্বরে পড়া।
১৬. ঈদের নামাযের পরে খুতবা। খুতবা দেয়া সুন্নত, কিন্তু শোনা ওয়াজিব।

●

## ১. ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য

শাওয়াল মাসের পহেলা তারিখে ঈদুল ফিত্‌র অনুষ্ঠিত হয়। এর পূর্বের মাস রমযান মাস। এ মাসে মুসলমানরা ফরয হিসেবে সিয়াম সাধনা করে থাকে। পূর্ণ একমাস তারা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পানাহার ও কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে দীর্ঘ রাত জেগে তারাবীহ্‌র নামায আদায় করে। আবার ভোররাতে সেহরী খাওয়ার জন্যে জেগে উঠে। এ অনুশীলন গোটা রমযান মাস চলতে থাকে। পূর্ণ একমাস যে তারা এ কঠিন অনুশীলনীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ফরমান পালন করতে পেরেছে, তারই আনন্দ প্রকাশের জন্যে ইসলাম মুসলমানদেরকে এদিন নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ হিসেবে দিনটি মুসলমানদের শুকরিয়া আদায় ও আনন্দ প্রকাশের দিন।

## ২. সদাকাতুল ফিতর

মুসলমানরা রমযান মাসে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পন্থায় পূর্ণ একমাস সিয়াম সাধনা করে। তারা যথাসাধ্য এ দায়িত্ব নির্ভুলভাবে পালন করার চেষ্টা করে। তারপরও মানুষ হিসেবে ভুলত্রুটি হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সদাকাতুল ফিতর আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের সে ভুলত্রুটি মাফ করে দেন। ঈদ উপলক্ষে এ সদাকা প্রদানের অন্যতম তাৎপর্য হলো, এর দ্বারা গরীব ও নিস্ব মুসলমানরা ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে। তাই এই ঈদের প্রধান বৈশিষ্টই হচ্ছে সদাকাতুল ফিতর।

ইসলামের পরিভাষায় সদাকাতুল ফিতর হচ্ছে সেই সদাকা, যা রমযানের রোযা শেষ করবার সাথে সাথে বিত্তবানগণ কর্তৃক বিত্তহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

## ৩. সদাকাতুল ফিতরের গুরুত্ব

সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। আহলে হাদিসের মতে এ সদাকা ফরয। প্রত্যেক স্বচ্ছল মুসলমান নারী পুরুষ, নাবালেগ ও সাবালেগের পক্ষ থেকে এ সদাকা পরিশোধ করতে হবে। নবী করীম সা. শহরের অলিতে গলিতে লোক পাঠিয়ে এ ঘোষণা করে দেন যে, সাবধান, সদাকায়ে ফিতর প্রত্যেক মুসলমান নারী পুরুষ, আযাদ গোলাম ও ছোট বড় সকলের উপর ওয়াজিব। (তিরমিযি)

## ৪. সদাকাতুল ফিতরের নিসাব

রমযান মাসের রোযা শেষ হবার সময় যে মুসলমানের নিকট যাকাতের নিসাবের পরিমাণ (চাই তার উপর যাকাত ফরয হোক কিংবা না হোক) সম্পদ থাকে তার উপরই সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। কোনো ব্যক্তির যদি ব্যবহারের অতিরিক্ত বাড়ি বা আসবাবপত্র থাকে তবে তার উপর সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব, যদিও তার যাকাত দিতে হবেনা। গোলাম ও নাবালেগ ছেলেমেয়েদের ফিতরা অভিভাবককে পরিশোধ করতে হবে।

## ৫. সদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

সুন্নতে রসূলের আলোকে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র. তাঁর বেহেশ্তী জেওর গ্রন্থে লিখেছেন, একজনের সদাকায়ে ফিতর এক সের সাড়ে বার ছটাক গম। সাবধানতার জন্যে দু'সের দেয়া ভালো। এ সদাকা গম, গমের আটা বা এর মূল্য হিসেবে করে দেয়া যায়।

তবে আমাদের মতে যে দেশের মানুষের যেটা প্রধান খাদ্য, সে দেশে ফিতরা হিসেবে সেই খাদ্য শস্য বা তার মূল্যই প্রদান করা উচিত।

যাকাত প্রদানের খাতসমূহে সদাকায়ে ফিতর বা ফিতরা প্রদান করতে হবে।

## ৬. সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবার সময়

সদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবার সময় হচ্ছে ঈদের দিন সকাল। অবশ্য আহলে হাদিসের মতে রমযানের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর থেকে আরম্ভ করে পরদিন ঈদের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত এ সময়। হানাফী মযহাবের মতে যেহেতু এ সময় ঈদের দিন সকাল, তাই কোনো ব্যক্তি ফজরের পূর্বে মারা গেলে কিংবা সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলে তার উপর সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবেনা।

## ৭. সদাকাতুল ফিতর পরিশোধ করার সময়

হাদিস থেকে জানা যায়, সাহাবায়ে কিরাম ঈদের দু'একদিন আগেই ফিতরা বন্টন করতেন। মূলত এটাই উত্তম পদ্ধতি। কারণ এতে করে গরীব দুখীরা ঈদের জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারে এবং ঈদের আনন্দে শরীক হবার সুযোগ পায়। রসূলে করীম সা. বলেছেন :

যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে সদাকাতুল ফিতর পরিশোধ করলো, সেটাই আল্লাহ্র নিকট গৃহীত সদাকাতুল ফিতর। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে দিলো, তারটা হবে অন্যান্য দানের মতোই একটি দান মাত্র। (..............)

যে ব্যক্তি কোনো কারণে রোযা রাখতে পারেনি, তার উপরও সদাকাতুল ফিত্র পরিশোধ করা ওয়াজিব।

একজনের ফিতরা একজনকেও দেয়া যায়, কয়েকজনকেও দেয়া যায়। আবার কয়েকজনের ফিতরাও একজনকে কিংবা কয়েকজনকে দেয়া যায়।

## ৮. ঈদুল ফিতরের মর্যাদা

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

ঈদুল ফিতরের দিন এলে আল্লাহ্ তায়ালা রোযাদারদের নিয়ে তার ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন। তিনি বলেন, হে আমার ফেরেশতারা, ঐ শ্রমিক কি পুরস্কার পেতে পারে যে তার কার্য পূর্ণভাবে সম্পন্ন করেছে? ফেরেশতারা জবাব দেয়, প্রভু! তার পূর্ণ পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়াই তার পুরস্কার।

আল্লাহ্ বলেন, হে আমার ফেরেশতারা, আমার দাস ও দাসীরা তাদের উপর ধার্যকৃত ফরয (রোযা) পূর্ণ করেছে। অতপর আমার বড়ত্ব প্রকাশ করতে করতে দোয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। আমার সম্মান, শৌর্য, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার কসম, আমি অবশ্যি তাদের দোয়া কবুল করবো। এরপর তিনি তার বান্দাহ ও বান্দীদের সম্বোধন করে বলেন, যাও ফিরে যাও! আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম আর তোমাদের সমস্ত মন্দকে কল্যাণ দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন, অতপর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাবে। (বায়হাকী)

●

# ৪

# ঈদুল আযহা

## ১. ঈদুল আযহার তাৎপর্য

ঈদুল আযহা মূলত হযরত ইব্রাহীম আ. কর্তৃক পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার সেই খোদায়ী নির্দেশের স্মারক। যিল হজ্জ মাসের দশ তারিখে এ ঈদ ও কুরবানী অনুষ্ঠিত হয়।

আমরা হযরত ইব্রাহীম আ.-এর মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যেমন আল্লাহ্‌র নির্দেশে জীবনের সবচাইতে প্রিয় সম্পদও তাঁর উদ্দেশ্যে কুরবানী করতে প্রস্তুত ছিলেন, ঈদুল আযহার দিন মুসলমানরা তেমনি পশু কুরবানীর মাধ্যমে নিজেদের প্রিয়তম সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করার সাক্ষ্য প্রদান করে।

হযরত ইব্রাহীম আ.-এর সেই মহত্ত্ব ও মকবুল কুরবানীকে শাশ্বত রূপদানের জন্যেই আল্লাহ ও তাঁর রসূল এই দিন মুসলমানদেরকে ঈদুল আযহা উপহার দিয়েছেন এবং কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মূলত এটাই হচ্ছে ঈদুল আযহার তাৎপর্য। কুরবানীর আলোচনায় সম্মুখে আমরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করবো।

## ২. তাকবীরে তাশরীক

যিল হজ্জ মাসের নয় তারিখ ফজরের নামায থেকে তের তারিখ আসর নামায পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব।

তাকবীরে তাশরীক হচ্ছে :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

যিল হজ্জ মাসের নয় তারিখকে 'আরাফার দিন' বলে, দশ তারিখকে 'ইয়াওমুন্নহর' বা কুরবানীর দিন আর এগার, বার এবং তের তারিখকে বলে আইয়্যামে তাশরীক। এই পাঁচ দিন হজ্জের দিন। এই পাঁচ দিনই তাকবীর পড়তে হয়।

তাকবীরে তাশরীক নামাযের পরে উচ্চস্বরে পড়তে হয়। মেয়েরা নিশব্দে পড়বে। মেয়েদের জন্যে এ তাকবীর ওয়াজিব নয়, সুন্নত।

# কুরবানী[১]

## ১. কুরবানীর অর্থ

কুরবানীর আভিধানিক অর্থ আত্ম ত্যাগ, অপরের জন্যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করা ইত্যাদি।

ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহ্ তায়ালাকে নিজের জীবন ও ধন সম্পদের প্রকৃত মালিক স্বীকার করে, সেই মহান মালিকের ইচ্ছানুযায়ী তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এগুলোকে তাঁরই পথে ত্যাগ করার নিদর্শন স্বরূপ নির্দিষ্ট পন্থায় পশু যবেহ্ করার নামই হচ্ছে কুরবানী।

## ২. কুরবানীর উদ্দেশ্য

প্রকৃতপক্ষে কুরবানীর তিনটি মৌলিক ও মহান উদ্দেশ্য রয়েছে।

এক : আল্লাহর একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার, সারা দুনিয়ার মুসলমান আল্লাহ্প্রেমিক মানুষ কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র নামে পশু যবেহ্ করে। কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে কুরবানী করে। কেবল তাঁরই রসূল প্রদর্শিত পন্থায় কুরবানী করে। এসবের মাধ্যমে তারা এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি ছাড়া ইলাহ্ ও মাবুদ হবার যোগ্য আর কেউ নেই। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সার্বভৌমত্বের মালিক কেবলমাত্র তিনিই। তাছাড়া আর কারো আইন ও বিধান মানা যেতে পারেনা। তাঁর শরীয়তই সাফল্যের পথ আর তাঁর সন্তুষ্টি বিধানই মুক্তির চাবিকাঠি।

দুই : কুরবানীর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার মালিকানা স্বীকার করা। অর্থাৎ সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালা। তিনিই অনুগ্রহ্ করে আমাদের জীবন ও ধন সম্পদ দান করেছেন। আমাদের জীবন ও সম্পদের প্রকৃত মালিক তিনিই। এ জীবন ও সম্পদ তিনি আমাদের নিকট আমানত রেখেছেন। এগুলো ব্যয় ও পরিচালনার ব্যাপারে আমি স্বেচ্ছাচারী হতে পারিনা। প্রকৃত মালিকের ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি মাফিকই এগুলোর ব্যয় ও পরিচালনা করবো। তাঁরই ইচ্ছা ও

১. এ প্রবন্ধটি ১৯৮৫ সালের ২৬ আগস্ট ঈদুল আযহা উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সন্তুষ্টি অনুযায়ী আমার জীবন ও সম্পদ ব্যয় করার জন্যে আমি সদাপ্রস্তুত। এ প্রস্তুতির নিদর্শন স্বরূপই তাঁর নামে পশু কুরবানী করছি। পশু যবেহর সাথে সাথে তার গলদেশ থেকে যেভাবে রক্ত প্রবাহিত হয়, আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে তার পথে এমনি করেই আমার বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতেও একনিষ্ঠভাবে প্রস্তুত।

তিন : কুরবানীর তৃতীয় মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার। অর্থাৎ আমার যাবতীয় ধন সম্পদ আল্লাহ্রই নেয়ামত। এগুলো তিনিই আমাকে দান করেছেন। এগুলো তাঁরই একান্ত অনুগ্রহ। তাঁরই মহান ও সীমাহীন অনুগ্রহের জন্যে আমি তাঁর নিকট আন্তরিক ও একনিষ্ঠভাবে কৃতজ্ঞ। আমার প্রতি তাঁর এ সীমাহীন অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ সম্পদ আমি তাঁরই নামে কুরবানী করছি। আমি যে তাঁর নিকট সত্যি কৃতজ্ঞ, আমার এ কুরবানী তাঁরই নিদর্শন।

## ৩. কুরবানীর ইতিহাস মানব জাতির মতোই প্রাচীন

আল্লাহ্ পুরস্তির কুরবানী নামক এ মহান নিদর্শন মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল শরীয়তেই কার্যকর ছিলো। সকল নবীর উম্মতকেই কুরবানী করতে হয়েছে।

কুরবানী একটি খোদায়ী বিধান, মানবজাতির সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এ বিধান কার্যকর হয়ে আসছে। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তায়ালা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. (الحج : ٣٤)

অর্থ : আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে কুরবানীর বিশেষ রীতি পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি, যেনো তারা আমার দেয়া পশুর উপর আল্লাহ্র নাম নিতে পারে। (সূরা হজ্জ : আয়াত ৩৪)

## ৪. মানব ইতিহাসে প্রথম কুরবানী

দুনিয়ার প্রথম মানুষ ছিলেন হযরত আদম আ.। বিবি হাওয়া ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তাঁদের থেকে জন্ম নেয় তাঁদের সন্তান সন্ততি। হযরত আদমেরই দু'সন্তানের কুরবানীর ঘটনা কুরআন মজীদে উল্লেখ হয়েছে। সম্ভবত এটাই ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম কুরবানী। কুরআন পাকে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. (المائده : ٢٧)

অর্থ : তাদেরকে আদমের দু'পুত্রের ঘটনাটি ঠিকভাবে শুনিয়ে দাও। (তা হচ্ছে এই যে,) তারা দু'জনই কুরবানী করলো। তখন তাদের একজনের কুরবানী কবুল করা হলো আর অপরজনের কুরবানী কবুল করা হলোনা। সে বললো, আমি তোমাকে হত্যা করবো। উত্তরে সে বললো, আল্লাহতো মুত্তাকীদের কুরবানীই কবুল করেন। (সূরা আল মায়িদা : আয়াত ২৭ )

হযরত আদম আ.-এর পর সকল উম্মতের মধ্যেই অবিচ্ছিন্নভাবে কুরবানীর ধারাবাহিকতা চলতে থাকে।

## ৫ . আমাদের কুরবানী সুন্নতে ইব্রাহীমি

হযরত ইব্রাহীম আ.-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হয় তাঁর প্রিয় পুত্রকে কুরবানী করার। কিশোর ইসমাঈলের নিকট তিনি আল্লাহর নির্দেশ ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে পিতার মতো তিনিও আল্লাহর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দেন। অতপর বৃদ্ধ পিতা প্রাণের টুকরা সন্তানকে উপুড় করে শুইয়ে কুরবানী করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে পুত্র ছুরির নিচে ঘাড় পেতে দিয়েছে। পিতাপুত্রের এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য অবলোকন করে দয়াময় আল্লাহর রহমতের দরিয়া যে কি রকম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, তাঁর মহব্বতের দরিয়া যে কিভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তা কেবল কল্পনাই করা যেতে পারে, বর্ণনা করা সম্ভব নয়। দয়াময় আল্লাহ বলেন :

وَنَادَيْنَهُ اَنْ يَّاِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ، اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰؤُ الْمُبِيْنُ- وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ.

অর্থ : তখন আমি ডেকে বললাম, ইব্রাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে! আমি সৎ লোকদের এমনি করেই প্রতিফল দান করে থাকি। অবশ্যি এটা একটা স্পষ্ট পরীক্ষার ব্যাপারে ছিলো। আর আমি ফিদিয়া (বিনিময়) স্বরূপ এক বিরাট কুরবানী দিয়ে তাকে (ইসমাঈলকে) উদ্ধার করলাম। আর ভবিষ্যতের উম্মতের জন্যে আমরা (ইব্রাহীমের) এ সুন্নত স্মরণীয় করে রাখলাম। (সূরা সাফফাত : আয়াত ১০৪-১০৮)

অর্থাৎ যে ফিদিয়া দ্বারা হযরত ইসলাঈল আ.-কে কুরবানী করা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত সেই ফিদিয়ার কুরবানী চলবে। এভাবে আত্মোৎসর্গের নিদর্শন স্বরূপ কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা আল্লাহর নামে শুধু কুরবানী করবে।

## ৬. রসূলুল্লাহ্ সা.-এর প্রতি কুরবানীর নির্দেশ

পবিত্র কালামেপাকে নবী করীম সা.-কে সালাত আদায় করার মতো কুরবানী করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা কাউসারে বলা হয়েছে :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.

অর্থ : তোমার রবের জন্যে নামায পড়ো এবং কুরবানী করো। (সূরা কাউসার : আয়াত ২)

অন্যত্র বলা হয়েছে :

قُلْ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.
(الانعام : ١٦٢)

অর্থ : হে নবী! বলো, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু কেবলমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনেরই জন্যে। (সূরা আনআম : আয়াত ১৬২)

তিরমিযি শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে, নবী করীম সা. মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি প্রতি বছর কুরবানী করতেন। অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সা. বলেছেন, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করেনা সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে। (আবু হুরাইরা : মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ)

এ আলোচনা থেকে জানা গেলো, নবী করীম সা.-কে কুরবানীর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি কুরবানী করেছেন এবং উম্মতকে কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন।

## ৭. কুরবানীর শরয়ী মর্যাদা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়েছে যে, কুরবানী করা আল্লাহর নির্দেশ এবং রাসূল সা.-এর আমলী সুন্নত। অবশ্য কুরবানীর শরয়ী মর্যাদা সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ আছে, তা নিম্নরূপ :

ইব্রাহীম নখয়ী, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম মুহাম্মদ, এক বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবু ইউসুফ প্রমুখ ফকীহগণ কুরবানী করাকে সাধারণ সামর্থবান মুসলমানদের জন্যে ওয়াজিব বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে কুরবানী হচ্ছে সুন্নতে মুসলেমীন। ইমাম সুফিয়ান সওরী মনে করেন, কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে কুরবানী না করলে তাতে দোষ নেই। কিন্তু "সমস্ত মুসলমান একযোগে তা পরিত্যাগ করলেও দোষ হবেনা, এমন মত মুসলিম উম্মাহর কোনো আলেম প্রকাশ করেননি।" (তাফহীমুল কুরআন, সূরা হজ্জ, টীকা : ৭৪)

## ৮. কুরবানীর ফযীলত

কুরবানী এক বিরাট মর্যাদা সম্পন্ন ইবাদত। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের এক অতি উত্তম পন্থা। গুনাহ খাতার মাফি লাভের কার্যকর উপায়। নবী করীম সা. বলেছেন :

কুরবানী হচ্ছে তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের সুন্নত। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এতে কি আমাদের জন্যে সওয়াব আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ প্রত্যেক পশমের জন্যে একেকটি সওয়াব। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

তিনি আরো বলেছেন :

নহরের দিন আল্লাহর নিকট কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করা থেকে ভাল কাজ আর কিছু নাই। কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশু তার শিং পশম ও ক্ষুরসহ বাহির হবে। কুরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে মনের আগ্রহসহ কুরবানী করো। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

একবার কুরবানীর সময় হুযূর সা. নিজ কন্যা ফাতিমাকে ডেকে বলেন, ফাতিমা এসো! তোমরা কুরবানীর নিকট দাঁড়িয়ে থাকো। কেননা এর যে রক্ত কণিকা মাটিতে পড়বে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ সুসংবাদ কি শুধু আহলে বাইয়াতের জন্যে না গোটা উম্মতের জন্যে? রসূলে করীম জবাবে বললেন, আহলে বাইয়াতের জন্যেও এবং গোটা উম্মতের জন্যেও। (আসান ফেকাহ)

## ৯. কুরবানী করতে হবে আল্লাহর নামে

হযরত ইব্রাহীম আ.-এর পর বহু শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার মাধ্যমে আরববাসী শির্কে লিপ্ত হয়। তারা কেবল আল্লাহর নামেই কুরবানী করতোনা। তাদের মূর্তি ও দেব দেবীর নামেও কুরবানী করতো। কুরবানী কবুল করার জন্যে কুরবানীকৃত পশু মূর্তির সামনে নিয়ে ফেলে রাখতো। অতপর আল্লাহর কুরআন ও নবী এসে তাদেরকে এ শির্ক থেকে পবিত্র করে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহকৃত জন্তুকে কুরআন সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। কুরআন কুরবানীর পশুকে আল্লাহর নামে যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছে (সূরা হজ্জ : আয়াত ৩৬)। আল্লাহ্র নামে কুরবানী করার কয়েকটি নিয়ম হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ –

অর্থ : আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ! এ নেয়ামত তোমারই দেয়া আর তোমারই জন্যে তা উৎসর্গ করলাম।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ –

**অর্থ :** আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। হে আল্লাহ! এটা তোমারই সম্পদ আর তোমারই জন্যে উৎসর্গ করলাম। এবং

اِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ -

**অর্থ :** আমি এ পৃথিবী ও মহা বিশ্বের স্রষ্টার দিকে আমার চিন্তা-চেতনা ও মনোযোগ নিবদ্ধ করলাম। আমি একনিষ্ঠভাবে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী। আমি মুশরিক নই। আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মৃত্যু নিখিল জগতের মালিকের জন্যে উৎসার্গীত। তাঁর কোনো শরীক নেই। একথাগুলো মেনে নেয়ার র্নিদেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। আমি সবার আগে একথাগুলো মেনে নিয়েছি। হে আল্লাহ্! এর (পশুর) মালিক তুমি এবং তোমারই জন্যে কুরবানী করছি।

এর কোনো একটি দোয়া পড়ে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে কুরবানীর পশু যবেহ্ করতে হয়।

## ১০. কেবল মুত্তাকীদের কুরবানীই কবুল হয়

যারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে পশু যবেহ্ করে তাদের কুরবানী কবুল হবার প্রশ্নই উঠেনা। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং শরীয়তের বিধান পালনের নিয়ত ছাড়া অন্য কোনো নিয়তে কুরবানী করে তাদের কুরবানীও কবুল হয়না। বরঞ্চ যারা আল্লাহর বিধান পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর পথে জীবন যাপন করে, কেবল তাদের কুরবানীই কবুল হয়ে থাকে। এ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য হলো :

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ.

**অর্থ :** আল্লাহ শুধুমাত্র মুত্তাকীদের কুরবানীই কবুল করেন। (সূরা মায়িদা : আয়াত ২৭)

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَادِمَاءُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

(الحج : ٣٧)

**অর্থ :** ঐসব পশুর রক্ত আর মাংস আল্লাহর নিকট কিছুতেই পৌছেনা বরঞ্চ

তোমাদের 'তাকওয়াই' তাঁর নিকট পৌঁছে থাকে। (সূরা হজ্জ : আয়াত ৩৭)

## ১১. কুরবানী কাদের জন্যে ওয়াজিব

হজ্জব্রত পালনকারীদের জন্যে কুরবানী ওয়াজিব। এছাড়া অন্যান্য মুসলমানদের উপর কুরবানী ওয়াজিব হবার শর্ত দুটি। এক. তাকে সাহেবে নিসাব হতে হবে। অর্থাৎ যার উপর সদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব, তার উপর কুরবানী ওয়াজিব। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে মুকীম হতে হবে। মুসাফিরের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। কোনো অসচ্ছল ব্যক্তি যদি ১২ই যিল হজ্জ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বে সচ্ছল হয়ে যান, তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। মুসাফির যদি ১২ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বে মুকীম হন, তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। কোনো অসচ্ছল ব্যক্তি যদি কুরবানী করার নিয়তে পশু খরিদ করে থাকে তবে তার উপরও কুরবানী করা ওয়াজিব। এমনকি কুরবানীর পূর্বে তার এ পশুটি খোয়া গেলে আরেকটি পশু কিনে তাকে ওয়াজিব আদায় করতে হবে।

## ১২. কুরবানীর পশু

ছয় প্রকার পশু কুরবানী করা যায়। যেমন- উট, দুম্বা, ভেড়া, ছাগল, গরু, মহিষ। এর বাইরে অন্য কোনো পশু দ্বারা কুরবানী করলে কুরবানী হবেনা।

কুরবানীর জন্যে উট কমপক্ষে পাঁচ বছর বয়সের হতে হবে। গরু ও মহিষ অন্তত দুই বছর বয়সের হতে হবে। আর দুম্বা, ছাগল, ভেড়া হতে হবে অন্তত এক বছর বয়সের।

কুরবানীর পশু মোটা তাজা এবং দেখতে মানানসই হওয়া দরকার। দুর্বল, জীর্ণশীর্ণ, এক পা খোঁড়া, গোড়া থেকে শিং ভাংগা, কান ও লেজ অনেকটা কাটা ইত্যাদি ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারা কুরবানী হয়না।

## ১৩ . কুরবানীর অংশীদার

উট মহিষ ও গরুর মধ্যে উর্ধ্বপক্ষে সাতজন পর্যন্ত অংশীদার হতে পারবে। এর কম হলেও ক্ষতি নেই। ভেড়া, দুম্বা ও ছাগল একজনের পক্ষ থেকে একটাই কুরবানী করতে হবে।

একই পশুকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কুরবানী করার জন্যে দুটি শর্ত রয়েছে : ১. সকল অংশীদারেরই কুরবানী বা আকীকার নিয়ত থাকতে হবে। কোনো অংশীদারের কেবল গোশত খাওয়া বা অন্য কোনো নিয়ত থাকলে সকলের কুরবানীই বরবাদ হয়ে যাবে।

২. দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, ভাগের প্রতিটি অংশ সমান হতে হবে।

## ১৪. কুরবানীর তারিখ ও সময়

যিল হজ্জ মাসের দশ থেকে বারো তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কুরবানীর সময়। এ তিন দিনের যে কোনো দিন কুরবানী করা জায়েয। কুরবানী করতে হবে ঈদের সালাত আদায় করার পর। অবশ্য কোনো কোনো ফকীহ্র মতে, অজপাড়াগাঁয়ের লোকেরা ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে কুরবানী করতে পারে। কারণ তাদের ঈদগাহসমূহ থাকে অনেক দূরদূরান্তে। সালাত আদায় করে ফিরতে ফিরতে তাদের অনেক বিলম্ব হয়ে যায়।

## ১৫. মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা

সচ্ছল অবস্থার লোকেরা নিজের ওয়াজিব কুরবানী ছাড়াও নিজ মুরুব্বী ও উস্তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করতে পারেন। যেহেতু কুরবানীতে অফুরন্ত সওয়াব রয়েছে, তাই তা যতো বেশি করে করা যায় ততোই সওয়াব লাভ করা যাবে। নবী করীম সা. এবং উম্মুল মুমেনীনগণের পক্ষ থেকেও কুরবানী করা যায়।

## ১৬. কুরবানীর পশু যবেহ্ করার নিয়ম

পশুকে বাম বাহুর উপর শুইয়ে কেবলামুখী করে যবেহ করতে হবে। কেবল উটের বেলায় এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। নিজের কুরবানী নিজে করাই উত্তম। যবেহ করতে অক্ষম ব্যক্তি এবং নারীরা নিজ নিজ কুরবানী অবলোকন করবেন। ভাগের পশুকে সকল অংশীদার একত্রে ধরে শুইয়ে যবেহ করবেন। নিজ কুরবানী নিজ হাতে করা এবং অবলোকন করার মাধ্যমে কুরবানীকারীর অন্তরে এ অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, আমি আল্লাহর দেয়া সম্পদ আল্লাহরই জন্যে কুরবানী করছি। এ পশুর রক্তের মতোই আমি আল্লাহর রাহে আমার বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে প্রস্তুত আছি।

## ১৭. কুরবানীর গোশ্ত

কুরবানীর গোশ্ত কি করতে হবে সে সম্পর্কে কালামেপাকে বলা হয়েছে :

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ.

(سورة الحج : ٣٦)

অর্থ : কুরবানীর পর যখন পশু নির্জীব হয়ে যাবে, তখন তা থেকে তোমরা নিজেরা খাও এবং ঐসব লোকদের খেতে দাও, যারা অল্পে তুষ্ট এবং যারা কারো কাছে হাত পাতেনা। আর ঐসব লোকদেরকেও দাও, যারা নিজেদের প্রয়োজন পেশ করে। (সূরা হজ্জ : আয়াত ৩৬)

কুরবানীর গোশ্ত নিজে খাওয়া যায়, আত্মীয় স্বজন ও গরীব দুখীদের মধ্যেও

বন্টন করা যায়। এক তৃতীয়াংশ ফকীর মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে বাকীটা নিজেরা, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব মিলে খাওয়া যায়। কিন্তু এটা কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নয়।

কুরবানীর গোশ্ত অমুসলিমদেরও দেয়া যায়। কিন্তু মজুরী বাবদ দেয়া যাবেনা।

## ১৮. কুরবানীর চামড়া

কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে তার মূল্য অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বন্টন করতে হয়। এতীম অসহায়দের দান করা যায় কিংবা গরীবদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্যে কেউ কোনো প্রকল্প গ্রহণ করে থাকলে তাতেও দান করা যায়। চামড়া সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্যে এটা একটা উত্তম পন্থা। কেউ ইচ্ছে করলে জায়নামায বানিয়ে কুরবানীর চামড়া নিজেও ব্যবহার করতে পারে।

## ১৯. কুরবানকারীর মুস্তাহাব আমল

হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সা. বলেছেন, যার কুরবানী করতে হবে, সে যেন চাঁদ দেখার পর যতোক্ষণনা কুরবানী করেছে, ততোক্ষণ চুল ও নখ না কাটে।" (মুসলিম)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরবানী করার নিয়ত রাখেন তিনি যেনো যিল হজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে নিজের নখ ও শরীরের কোনো অংশের চুল না কাটেন। তার জন্যে মুস্তাহাব হচ্ছে, তিনি কুরবানীর দিন কুরবানীর পর এগুলো পরিষ্কার করলে এটা তার জন্যে কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হবে। যিনি কুরবানী করবেন, কুরবানীর কলিজা বা গোশ্ত দিয়ে সেদিনকার খানা আরম্ভ করা তার জন্যে মুস্তাহাব।

## ২০. কুরবানী মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক

সারা দুনিয়ার মুসলমান ঈদুল আযহার দিন কুরবানী করার মাধ্যমে এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, তারা এক উম্মাহ্র অন্তর্ভুক্ত। কেবলমাত্র আল্লাহ্র নামে পশু কুরবানী করে তারা একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ই তাদের মালিক, তিনি তাদের মাবুদ, তিনিই তাদের রব। তাঁর ছাড়া আর কারো আইন ও বিধান তারা মানেনা। ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কুরবানী করে তারা একথা প্রমাণ করে যে, ইসলামই তাদের জীবনাদর্শ। এটাই তাদের চলার পথ। এটাই হচ্ছে তাদের জীবন বিধান। তারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো পথ ও মত মানতে রাজী নয়। মুহাম্মদ সা.এর সুন্নতের ভিত্তিতে কুরবানী করে তারা একথারই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনিই তাদের প্রকৃত নেতা ও পথ প্রদর্শক। তাঁর ছাড়া কারো অনুবর্তন অনুসরণ করতে তারা রাজী নয়। মোটকথা কুরবানী মুসলিম উম্মাহ্র একত্বের সাক্ষ্য, ঐক্যের প্রতীক।

সমাপ্ত

# আবদুস শহীদ নাসিম

## পরিচিতি ও লিখিত কয়েকটি বই

### লেখক পরিচিতি

আবদুস শহীদ নাসিম
এর জন্ম
১৯৪৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
বর্তমান চাঁদপুর জেলার
ফরিদগঞ্জে।
তিনি ১৯৭২ সালে
ফরিদগঞ্জ
আলিয়া মাদ্রাসা থেকে
কামিল পাশ করেন।
১৯৭৫ এবং ১৯৭৬ সালে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
থেকে বাংলা সাহিত্যে
যথাক্রমে
অনার্স ও মাস্টার্স
ডিগ্রি লাভ করেন।
অবশ্য তিনি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও
কিছুকাল পড়া লেখা করেছেন।
ছাত্র জীবন থেকেই
তিনি বিভিন্ন
পত্র পত্রিকায়
লেখালেখি শুরু করেন।
আবদুস শহীদ নাসিম
একজন প্রতিষ্ঠিত
সৃজনশীল লেখক।
তাঁর মৌলিক রচনা
৪০ -এর অধিক।
তাঁর অনূদিত গ্রন্থও
৪০ -এর অধিক।
শিশু সাহিত্যিক
হিসেবেও
আবদুস শহীদ নাসিম
খ্যাতি অর্জন করেন।
তিনি এযাবত
অনেক গুলো
সাময়িকী সম্পাদনা
করেছেন।
সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন
প্রায় ২ ডজন গ্রন্থ।
এযাবত তাঁর লিখিত ও
অনূদিত ৮০-এর অধিক
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
তিনি এখনো লিখে যাচ্ছেন।

### মৌলিক রচনা

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
আল কুরআনের দু'আ
আসুন আমরা মুসলিম হই
কুরআন ও পরিবার
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অংগীকার
ঈমানের পরিচয়
মুক্তির পথ ইসলাম
ইসলামের পারিবারিক জীবন
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
নির্বাচনে জেতার উপায়
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন : সবরের পথ
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ও মাও.মওদূদী
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)

### কিশোরদের জন্যে লেখা বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম ও ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)

### অনূদিত কয়েকটি বই

আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
মহিলা ফিকহ্ ১ম ও ২য় খণ্ড
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
এন্তেখাবে হাদীস
যাদে রাহ্
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
দাওয়াত ইলাল্লাহ্ দা'য়ী ইলাল্লাহ্

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২